গুরুতর অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (victim) ও সাক্ষী সুরক্ষার প্রস্তাবিত আইনের শর্তাবলীর সুপারিশ বিষয়ক আইন কমিশনের প্রতিবেদন

প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি বর্ণনা এবং প্রস্তাবিত আইনের যুক্তি

১. আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থা বিশেষ করে ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (ভিকটিম) ও সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যথাযথ ব্যবস্থা বা বিধান না থাকায় ন্যায়বিচার দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এটা শুধু বিচার চলাকালীন সময়ে সাক্ষীর নিরাপত্তাজনিত কারণে স্বাক্ষীর অনুপস্থিতি বা সাক্ষীর বৈরী হয়ে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক মামলা দায়েরে ভীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রায়শ: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই সংঘটিত অপরাধ বা অন্যায়ের অন্যতম সাক্ষী। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ সম্পর্কে আইন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাতকরণ, মামলা দায়ের, তদন্ত বা বিচার পর্যায়ে সঠিক তথ্য বা সাক্ষী প্রদান নিরাপদ, নি:শঙ্কঁ ও নিশ্চিত না করতে পারলে, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

২. সাক্ষ্য আইনে (ধারা ১৫১, ১৫২) সাক্ষীকে অপমানজনক, কুরুচিপূর্ণ বা আগ্রাসী প্রশ্ন করার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ ছাড়া সাক্ষী সুরক্ষার আর কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। বিচারকগণ বিভিন্ন সময়ে সাক্ষী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আবেদন বা অভিযোগের ভিত্তিতে তার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দিয়েছেন, কিন্তু সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় সুরক্ষার বিষয়টি অবহেলিতই রয়ে গেছে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উপর একটি সামাজিক চাপ বা দাবি থাকলেও এ পর্যন্ত কোন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি।

৩. অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের পদ্ধতিগত অধিকার রক্ষা করার জন্য অনেক আইন রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫ অন্যতম। সে তুলনায় বাদী বা অভিযোগকারী ও সাক্ষীর পদ্ধতিগত বা নিরাপত্তাজনিত অধিকার বা স্বার্থ সুরক্ষার জন্য আইনী বিধান নিতান্তই অপ্রতুল। এছাড়া আমাদের দ্বন্দ্বমূলক (adversarial) বিচার ব্যবস্থায় বিচার বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে আইনজীবীদের প্রচুর সুযোগ থাকা এবং বিচারকদের উদ্যোগী ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের সীমাবদ্ধতার নেতিবাচক ফলাফল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা অভিযোগকারীকেই বেশী ভোগ করতে হয়।

৪. বিশ্বের অনেক দেশেই যেমন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইন, কলম্বিয়া, ব্রাজিল, ইতালী, নেদারল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, জার্মানীতে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা নীতি রয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও শ্রীলংকায় এ ধরণের আইন প্রণয়ন সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন সবচেয়ে বেশী বিকশিত হয়েছে গত দুই দশকে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি GW nK আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদলত সংক্রান্ত আইন এবং তদ্অধীন প্রণীত বিধিমালার মাধ্যমে। বর্তমান আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনের একটি মূল দিক হচ্ছে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়নকে উৎসাহিত ও প্রভাবান্নিত করা। এ প্রসঙ্গেঁ ২০০৮ সালে প্রণীত UNODC এর সাক্ষী সুরক্ষা আইনের আদর্শ খসড়া (Model

Witness Protection Bill) ও সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পিত অপরাধ বিষয়ক ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী সুরক্ষার জন্য অনুসরণীয় নীতি (Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime) সংক্রান্ত ম্যানুয়েল এবং অপরাধ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ভিকটিমদের জন্য ন্যায় বিচার করার মৌলিক নীতিমালা সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা, ১৯৮৫ (UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985) উল্লেখযোগ্য।

৫. মূল সমস্যা হচ্ছে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে তার বিরূদ্ধে যেন মামলা না হয় সেজন্য অপরাধী বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে হুমকি প্রদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাপ, হয়রানি সৃষ্টি, ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে ঘটনা সম্পর্কে পুলিশকে জ্ঞাত করা বা মামলা দায়ের করা থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। অন্যদিকে, মামলা দায়ের হলে তা প্রত্যাহার করা অথবা মামলা চালু হলে সাক্ষীদেরকে সাক্ষী প্রদান করা থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে উল্লিখিত হুমকি বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের অপপ্রয়াস চালায়। এ ধরণের হুমকি, ভীতি প্রদর্শন বা চাপ প্রয়োগ হত্যাসহ বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং জবরদস্তিমূলক বশীভূতকরণের রূপ পরিগ্রহ করে।

৬. খুন, রাহাজানি, মানব পাচার, অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, বৈদেশিক মুদ্রা পাচার, ইত্যাদির মত গুরুতর অপরাধের পেছনে সংঘবদ্ধ চক্র জড়িত থাকায় এবং অনেক সময় এদের পেছনে প্রভাবশালী মহলের মদদ বা ছত্রছায়া থাকায় এই অপরাধীরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। ফলে তারা শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীর প্রতিই নয়, বরং দেশের আইন-শৃপখলা এবং আইন-শৃপখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে, সত্য উদঘাটনে, যা ন্যায় বিচারের জন্য অপরিহার্য, সাক্ষীগণ নি:শঙ্ক চিত্তে নিরাপদে তাদের দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হন না। শুধু সাক্ষীর অভাবেই অনেক ভয়াবহ অপরাধের মামলার আসামী খালাস পেয়ে যায়। ফলে সমাজে অপরাধ দমনে অনেক বিকৃত পন্থার উদ্ভব হয়, যার ফলাফল ভাল নয়। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক অপরাধ, যেমন, গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, জলদস্যুতা, মাদকদ্রব্যের ব্যবসায়, ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ায় রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক আদালতে এ সমস্ত অপরাধের বিচারের জন্য ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষা আইনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

৭. শুধু হুমকি বা ভয়ভীতি প্রদর্শনই নয়, দ্বন্দ্বমূলক বিচার পদ্ধতিতে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে অভিযোগকারী ও সাক্ষীগণ অবর্ণনীয় ভোগান্তি ও বিড়ম্বনার শিকার হন। এর ফলে মামলার প্রক্রিয়া সঠিকভাবে ও সঠিক পথে চলে না। সাক্ষীগণ প্রায়শ: মামলার শুনানি স্থগিতের (adjournment) বিড়ম্বনায় পড়েন। শুধু তাই নয়, বিশেষ করে ধর্ষণ বা যৌন হয়রানিমূলক মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীকে এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন করা হয়, যা এক ধরণের মানসিক নির্যাতনের সামিল। এর ফলে সঠিক সাক্ষ্য হয় না; সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানে অনীহ হন; এবং ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্থ হয়।

৮. অপরাধী কর্তৃক ভীতির পরিবেশ সৃষ্টির কারণে প্রাথমিক তদন্তে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীর তথ্য ও জবানবন্দী বিচার পর্যায়ে রক্ষিত হয় না। এটা ন্যায় বিচারকরণে একটি বড় বাধা। তদন্ত পর্যায়ে পুলিশের চাপে কেউ কোন ফরমায়েশী জবানবন্দী দিতে বাধ্য হলে, তা অবশ্যই আদালতে পরিবর্তন করার সুযোগ

রয়েছে। এটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, সাক্ষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির একটি প্রধান অধিকার। তবে রুঢ় বাস্তবতা হচ্ছে প্রায়শ: জবানবন্দির পরিবর্তন ঘটে আসামী কর্তৃক বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন বা চাপ সৃষ্টির কারণে। সাক্ষীর বৈরী (hostile) হয়ে যাওয়া অর্থাৎ যে পক্ষের সাক্ষী সে পক্ষের বিরুদ্ধে বক্তব্য চলে যাওয়া ভীতি প্রদর্শনের একটি চরম পরিণাম। এ ছাড়া, রাজসাক্ষীর (approver) নিরাপত্তা বিধানও কর্তৃপক্ষের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

উল্লিখিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (ভিকটিম) ও সাক্ষীকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা জরুরী বলে প্রতীয়মান হয়। প্রস্তাবিত আইনের বিষয়বস্তু হিসেবে আইন কমিশন সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। সুপারিশমালা প্রণয়নে আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা অধ্যয়ন ও বিবেচনা করা ছাড়াও এ বিষয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা, প্রণীত আইন, বর্তমানে কার্যরত কয়েকটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) এর বিধানাবলী বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞ মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৬ সনে আইন কমিশন এ বিষয়ে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছিল। সেই খসড়ার কতিপয় দুর্বলতা ও ঘাটতি বর্তমান সুপারিশমালায় শোধরানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

সুপারিশমালা শুধু রাষ্ট্রীয় আইন ও রাষ্ট্রীয় আদালতের এখতিয়ারভুক্ত অপরাধসমূহ মাথায় রেখেই প্রণয়ন করা হয়নি, আন্তর্জাতিক অপরাধ, আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদলত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের এখতিয়ার ও কার্যাবলী এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালসমূহের সহযোগিতার বিষয়টিও এখানে স্থান পেয়েছে।

সুপারিশমালা

১। সংজ্ঞা

'ভিকটিম', 'সাক্ষী' ও 'সুরক্ষা' সম্পর্কে সকলের একটি সাধারণ ধারণা থাকলেও বাংলাদেশে বিদ্যমান কোন আইনে এর সংজ্ঞা বা বর্ণনা নেই। নিম্নে এই তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হলো ঃ

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ভিকটিম হচ্ছেন সে ব্যক্তি যিনি কোন অপরাধ সংঘটনের কারণে শারীরিক, মানসিক, মনঃস্তাত্ত্বিক, ভাবাবেগগত বা বৈষয়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবারের নিকটতম সদস্যবর্গ এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরিবারের অন্যান্য সদস্যও ভিকটিম বলে পরিগণিত হবেন।

(খ) সাক্ষী হচ্ছেন সে ব্যক্তি যিনি সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে জানেন এবং অপরাধ তদন্ত পর্যায়ে বা বিচারের সময় সে বিষয়ে তার সাক্ষ্য বা তথ্য প্রদান প্রয়োজন হতে পারে, কিংবা তিনি তথ্য প্রদানে আগ্রহী বা তথ্য বা সাক্ষ্য প্রদান করেছেন বা করবেন। তবে সাক্ষী বলতে শুধু বাদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষের সাক্ষীই বোঝাবে না, বিবাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষীকেও বোঝাবে।

(গ) ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষা হচ্ছে ভিকটিম বা সাক্ষীকে প্রয়োজনীয় সব সুরক্ষা প্রদান করা যাতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তার দোসররা ভীতি প্রদর্শন বা চাপ প্রয়োগ বা অন্যকোন উপায়ে তদন্ত বা বিচার পর্যায়ে তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে, এবং সাক্ষীগণ নিরাপদ ও ঝুঁকিহীনভাবে সাক্ষ্য বা কোন তথ্য প্রদান করতে পারেন। এই সুরক্ষা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজনে রায় ঘোষণার পরও অব্যাহত থাকবে। কারাদন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির দন্ডের মেয়াদ শেষ হবার পর সাক্ষী বা ভিকটিম যদি মুক্তি পাওয়া অপরাধীর কাছ থেকে কোন নিরাপত্তা ঝুঁকির আশঙ্কা করে সে ক্ষেত্রেও সুরাক্ষা ব্যবস্থা বহাল রাখতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে, সব ভিকটিম সাক্ষী না হলেও তারা সকলেই সাক্ষ্য বা তথ্য প্রদানের অধিকারী। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রেই ভিকটিমের সাক্ষ্য অপরাধ প্রমাণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ভিকটিমের বস্তুগত ক্ষতিপূরণ বা মানসিক/মনঃস্তাত্ত্বিক সন্তুষ্টি প্রদানও তাদের সুরক্ষার একটি অংশ বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

২। সুরক্ষার অধিকার

প্রত্যেক ভিকটিম বা সাক্ষীর রাষ্ট্রের নিকট হতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকতে হবে, যাতে সে নিরাপদে, নির্বিঘ্নে এবং ঝুঁকিহীনভাবে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট তার বক্তব্য পেশ এবং পরবর্তীতে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন। এই নিরাপত্তা শুধু তার শারীরিক নিরাপত্তাই নয়, বরং মানসিক বা মনঃস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, আর্থিক চাপ কিংবা কোন প্রলোভন থেকে নিরাপদ ও মুক্ত থাকারও অধিকার বোঝাবে।

৩। সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার

(ক) সুরক্ষা বা নিরাপত্তার জন্য আবেদন করার পূর্বে ভিকটিম বা সাক্ষীর এ ব্যবস্থার বিস্তারিত বন্দোবস্ত ও তা প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার থাকবে।

(খ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বা অন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ভিকটিম বা সাক্ষীকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে বাধ্য থাকবে।

(গ) সরকার সাধারণভাবে জনগণকে এ বিষয়ে জ্ঞাত বা সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪। সুরক্ষা বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা, কর্মসূচী ও বাস্তবায়ন সংস্থা

(ক) ভিকটিম ও সাক্ষীকে সকল প্রকার সুরক্ষা প্রদানের জন্য একটি জাতীয় নীতিমালা ও কর্মসূচী বা ব্যবস্থা (প্রোগ্রাম) থাকতে হবে। এই কর্মসূচীর আওতায় ভিকটিম বা সাক্ষীকে সুরক্ষা প্রদানের বিস্তারিত ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পদ্ধতি ও কর্ম পরিকল্পনা থাকবে। কর্মসূচী পরিচালনার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের নেতৃত্বাধীন একটি জাতীয় কমিটি থাকতে হবে যেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এটর্নী জেনারেলের অফিস, পুলিশ বিভাগ ও মানবাধিকার কমিশন এর প্রতিনিধি থাকবেন। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নির্বাহী সংস্থা গঠন করতে হবে, যেখানে উল্লিখিত মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অংশগ্রহণ থাকবে।

(খ) প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক মেট্রোপলিটন শহর এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিটি জেলা শহরে একটি করে সুরক্ষা অফিস থাকবে। এই অফিসসমূহ জাতীয় নির্বাহী সংস্থার তত্ত্বাবধানে জেলা পর্যায়ে সুরক্ষা কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। তদউদ্দেশ্যে একজন উপযুক্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে এই অফিস পরিচালিত হবে।

৫। সুরক্ষা প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্তির আবেদন

কোন ভিকটিম বা সাক্ষী নিজে বা তার প্রতিনিধি সরাসরি অথবা তদন্তকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে সুরক্ষা অফিসের বরাবর প্রয়োজনীয় সুরক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন। তদন্তকর্মকর্তা বা প্রসিকিউটরের নিকটও আবেদন করা যাবে। সে ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা বা প্রসিকিউটরের দায়িত্ব হবে তা সুরক্ষা অফিসে পেশ করা। এছাড়া বিচার আদলত মনে করলে বা আদালতের নিকট অনুরূপ আবেদন করলে আদালত সংশ্লিষ্ট অফিসকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করবেন। সুরক্ষা অফিস আবেদন গ্রহণ না করলে তার বিরুদ্ধে জাতীয় নির্বাহী সংস্থায় আপিল করাার সুযোগ রাখতে হবে।

৬। সুরক্ষার আবেদন গ্রহণের শর্তাবলী

(ক) যে অপরাধের ক্ষেত্রে ভিকটিম বা সাক্ষী সুরক্ষা চাইবেন সেটি কোন গুরুতর অপরাধ হতে হবে, যেমন, যার সাজা মৃত্যুদন্ড বা কমপক্ষে সাত বছর কারাদন্ড;

(খ) মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং এজন্য তার সাক্ষ্য গ্রহণ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হওয়া;

(গ) আবেদনকারী ভিকটিম/সাক্ষীর জন্য বড় ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে;

(ঘ) সাক্ষী নিজে সমাজ বা সুরক্ষা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ভিকটিম বা সাক্ষীর জন্য কোন প্রকার নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করবে না;

(ঙ) সুরক্ষা কর্মসূচী ব্যতীত ভিকটিম বা সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অন্যকোন নির্ভরযোগ্য বিকল্প ব্যবস্থা নাই।

৭। সুরক্ষা প্রাপ্ত ভিকটিম বা সাক্ষীর অধিকারসমূহ

(ক) ভিকটিম/সাক্ষীর জীবন ও মালামালের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পাওয়া;

(খ) তদ্‌উদ্দেশ্যে ভিকটিম/সাক্ষীর নিরাপদ আবাসন, অন্যত্র আবাসন (relocation) এর ব্যবস্থা;

(গ) প্রয়োজনে ভিকটিম/সাক্ষীর পরিচয় গোপন রাখা এবং অন্য পরিচয় প্রদান;

(ঘ) সুরক্ষা প্রদানকালীন সময়ে তার ভরণপোষণ, আর্থিক, স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের সাহায্য পাওয়া;

(ঙ) শুধু জীবনের প্রতি শারীরিক হুমকিই নয়, ভিকটিম/সাক্ষীর মান-মর্যাদা রক্ষা করা বা কোন মনঃস্তাত্ত্বিক চাপ, ইত্যাদি থেকেও তাকে মুক্ত রাখা;

(চ) বিচার স্থলে যাতায়তের নিরাপদ পরিবহণ নিশ্চিত করা এবং আদলত ভবন ও আঙ্গিনায় তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা;

(ছ) সুরক্ষা প্রাদানের পুরো প্রক্রিয়া গোপন রাখা, যেন ভিকটিম/সাক্ষীগণ প্রকাশ্যে চিহ্নিত হওয়ার কারণে ঝুঁকির মধ্যে না পড়েন;

(জ) সুরক্ষার আবেদন ও সুরক্ষা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও অন্যান্য সার্ভিস পাওয়ার অধিকার।

উল্লিখিত অধিকারসমূহ প্রদানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভিকটিম/সাক্ষীগণ যেন পূর্ণ নিরাপত্তা অনুভব করে তথ্য বা সাক্ষ্য প্রদানে স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎসাহিত বোধ করেন। তবে শর্ত থাকে যে, এ প্রক্রিয়ায় যেন কোন প্রকারেই অভিযুক্ত ব্যক্তির পদ্ধতিগত অধিকার লঙ্ঘিত না হয়।

৮। আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভিকটিম/সাক্ষীদের উল্লিখিত অধিকার ভোগ নিশ্চিত করবে।

৯। ভিকটিম/সাক্ষীর অধিকারের প্রতি কেউ হুমকি প্রদর্শন বা অধিকার ভোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১০। প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে ভিকটিম/সাক্ষীকে এই মর্মে লিখিত অঙ্গিকার করতে হবে যে, তিনি

(ক) তদন্তে বা আদালতে তথ্য এবং সাক্ষ্য প্রদান করবেন;

(খ) প্রোগ্রামের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবেন না; এবং

(গ) গোপনীয়তা রক্ষাসহ কর্মসূচীর শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিধানাবলী মেনে চলবেন।

১১। অন্যদিকে, সুরক্ষা অফিস এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভিকটিম/সাক্ষীকে সুরক্ষা কর্মসূচীর অধীন সকল প্রকার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানে বাধ্য থাকবে। কেউ তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সুনির্দিষ্ট দায় ও শাস্তির বিধান থাকবে।

১২। মহিলা ও শিশু ভিকটিম/সাক্ষীর জন্য বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। বিশেষ করে যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা জরুরী। প্রয়োজনে ক্যামেরা ট্রায়ালের ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং তাদের যাতে সরাসরি আসামীর সম্মুখীন হতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের মুখাবয়ব শেড করা, এবং ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জবানবন্দী গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জেরার সময় যেন এমন প্রশ্ন বা ইঙ্গিত না করা হয়, যা এক ধরনের নির্যাতনের পর্যায়ে পরে। বিবাদী পক্ষের উকিল দ্বারা জেরা না করে জেরার প্রশ্নসমূহ বিচারকের মাধ্যমেও সাক্ষীর সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে মৌখিক বক্তব্যের স্থলে শুধু লিখিত বক্তব্য পেশ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যা সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে সাক্ষ্য আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন প্রয়োজন হবে।

১৩। পাচারকৃত মহিলা ও শিশুদের উদ্ধারের পর বিশেষ সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অতীব জরুরী। এদের শুধু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় নেয়াই যথেষ্ট নয়, ক্ষেত্র বিশেষে এদের পরিচয় গোপন, আবাসন ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা ছাড়াও মনঃস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক সহায়তা প্রদান, সামাজিক পুনর্বাসন, ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। পরবর্তীতে তদন্ত বা বিচার কার্যে তাদের তথ্য ও সাক্ষ্য প্রদানেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিদেশে পাচারকৃত মহিলা ও শিশুদের উদ্ধার এবং তাদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৪। আন্তর্জাতিক অপরাধ, যেমন, গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ এবং শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে ভিকটিম/সাক্ষী সুরক্ষা বিষয়টি জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ অপরাধের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা। এখানে ভিকটিম/সাক্ষীর সংখ্যা যেমন অনেক বেশী হতে পারে, তেমনি তাদের প্রতি হুমকি আসতে পারে অনেক বড় চক্র এবং সংঘবদ্ধ গ্রুপ হতে। আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচার রাষ্ট্রীয় আদালতে অনুষ্ঠিত হোক, বা কোন আন্তর্জাতিক আদালতে অনুষ্ঠিত হোক, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থাই যেখানে প্রযোজ্য হবে। তবে যে বিচার কোন আন্তর্জাতিক আদলতে চলছে, সে আদালত বিধিসম্মতভাবে এবং সঠিক প্রক্রিয়ায় কোন রাষ্ট্রের কাছে এ বিষয়ে সহযোগিতা চাইলে সে রাষ্ট্র তা প্রদান করবে, যেমন, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদলতে বিচারাধীন মামলায় কোন সাক্ষী বা ভিকটিম আদালতের সংবিধি স্বাক্ষরকারী কোন রাষ্ট্রে অবস্থান করলে, উল্লিখিত সুরক্ষা ব্যবস্থা তার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৫। সুরক্ষার অবসান

নিম্নে বর্ণিত পরিস্থিতিতে সুরক্ষা ব্যবস্থার অবসান হতে পারবেঃ

(ক) যখন ভিকটিম/সাক্ষীর নিরাপত্তার প্রতি হুমকির অবসান হয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে;

(খ) কোন বিকল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংস্থান করা হয়েছে;

(গ) যে কারণ বা পরিস্থিতিতে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সে পরিস্থিতির অবসান হয়েছে;

(ঘ) সুরক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি সুরক্ষা ব্যবস্থার শৃঙ্খলা বা চুক্তি/অঙ্গিকারের শর্তাবলী ভঙ্গ করেছে;

(ঙ) সুরক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি মামলার তথ্য বা সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে;

(চ) যখন সুরক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেই সুরক্ষার অবসান চান।

যে কারণেই সুরক্ষার অবসান করা হোক না কেন, সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুরক্ষার অবসান সম্পর্কে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে যথাযথভাবে নোটিশ প্রদান করবে, এবং তার বক্তব্য শ্রবণের অধিকার নিশ্চিত করবে।

১৬। স্মরণ রাখতে হবে যে, ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষার একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হতে হবে যথা সম্ভব দ্রুত অপরাধের তদন্ত এবং বিচার কাজ নিস্পন্ন করা। দ্রুত ও সুষ্ঠু বিচার অনুষ্ঠান সুরক্ষার জন্য সহায়ক, এবং এতে সুরক্ষাকালীন সময়ের মেয়াদও কমে আসবে।

১৭। ভিকটিম ও সাক্ষী সুরক্ষা প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য একটি উপযুক্ত তহবিল থাকতে হবে, যেখানে সরকারী বরাদ্দ ছাড়াও বাইরের অনুদান গ্রহণের সুযোগ থাকাটা বিধেয়।

১৮। আমাদের দেশে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হলে শুধু সাজারই ব্যবস্থা আছে। খুব কম ক্ষেত্রেই ভিকটিমের পক্ষে কোন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। তদন্ত ও বিচার পর্যায়ে তথ্য ও সাক্ষ্য প্রদানকালীন সময়ে ভিকটিমের সুরক্ষার পাশাপাশি তাকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি কাঙ্খিত। এই ক্ষতিপূরণ শুধু সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হতেই প্রদেয় হবে না, এতদ্‌উদ্দেশ্যে বিশেষ তহবিলও গঠন করতে হবে।

১৯। সুরক্ষা প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের একটি রেজিস্টার থাকতে হবে যেখানে তাদের নাম, বিস্তারিত পরিচয় ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ থাকবে। পরিচয় পরিবর্তন করে নতুন পরিচয় প্রদান করা হলে তা লিপিবদ্ধ থাকবে। রেজিস্টারের তথ্যাবলীর গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।

মোহাম্মদ আবদুল মোবারক
সদস্য
আইন কমিশন

প্রফেসর এম. শাহ আলম
চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
আইন কমিশন